সংযোগ মাধ্যমের সেকাল - একাল

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

জীবনের প্রতিটি কাজই কোনও না কোনওভাবে সংযোগ স্থাপনের কাজ। সমাজে আমরা তো আর একা একা থাকি না। সত্যি কথা বলতে কি, বেঁচে থাকতে গেলে 'বেঁধে বেঁধে থাকতে' হয়। একের সঙ্গে অন্যের ভাব বিনিময় তাই আবশ্যক হয়ে ওঠে। ভাব বিনিময়ের চাই ভাষা, চাই লিপি। কিন্তু সভ্যতার আদিলগ্নে না ছিল ভাষা, না ছিল লিপি। সেখান দূরে আগুনের মশাল জ্বালিয়ে বিপদের সঙ্কেত পাঠাত মানুষ। কোনও মুখের ভাষা, লেখার লিপির প্রয়োজন হত না। ভাষা আসার পরও যে 'সংযোগ মাধ্যম' হিসেবে আগুনের প্রতীক গুরুত্ব হারাল তাও বলা যায় না। পাঠকের কি সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটির কথা মনে পড়ে না যেখানে উদয়ন পণ্ডিত আগুনের মশাল জ্বালিয়ে সঙ্কেত পাঠিয়েছিলেন গুপি -বাঘাকে?

অঙ্গভঙ্গিও যোগাযোগের এক জরুরি মাধ্যম। ভিন্ ভাষার দেশে বা রাজ্যে গিয়ে হাত দিয়ে বিশেষ ভঙ্গি করে জল পান করতে চাওয়া এবং তা পাওয়ার মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয় অঙ্গভঙ্গির কার্যকারিতা। এক কার্যকর মাধ্যম হিসেবে অঙ্গভঙ্গিকে আজও কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। মূকাভিনয় নামক এক জনপ্রিয় শিল্পের ভিত্তিই তো হল অঙ্গভঙ্গি।

একদিকে যেমন মূকাভিনয় অন্যদিকে তেমন শ্রাব্য মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র। তার জন্য সব সময় যে ভাষার দরকার হয় এমনও নয়। যে সব প্রাণী মানুষের মতো ভাষায় কথা বলে না তারা তাদের ডাকের মাধ্যমেই বার্তা পাঠায়; পাঠায় বিপদ সংকেতও। এক্ষেত্রেও উদাহরণ হিসেবে সন্দেহভাজন ব্যক্তির আনাগোনায় কুকুরের ডাকের কথা বলা চলে।

প্রাণীদের সঙ্কেত পাঠানোর আর এক উপায় গন্ধ। বাঘের ফেরোমন ব্যবহারের মাধ্যমে বার্তা পাঠানো সংক্রান্ত রতনলাল ব্রহ্মচারীর বিখ্যাত গবেষণার কথা প্রাণীবিজ্ঞানের জগতে অত্যন্ত সুবিদিত। পিঁপড়েদের সার বেঁধে চলা, মুখোমুখি হয়ে এক পিঁপড়ের অন্য পিঁপড়ের জন্য দু'দণ্ড অপেক্ষার পেছনেও রয়েছে ফেরোমন। এই গন্ধবার্তা এক বড় সংযোগ মাধ্যম। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য -এর ' পিঁপড়ের বুদ্ধি' গল্পটার কথা মনে পড়ে? আঠার ভিতরে পড়ে থাকা মৃত আরশোলার দেহ তুলে নিয়ে আসতে কাঁকরের সেতু তৈরি করেছিল পিঁপড়ে বাহিনী। আর তা সম্ভব হয়েছিল গন্ধবার্তা ফোরোমনের সংযোগ মাধ্যমে। মানুষের দুনিয়ায় সরাসরি গন্ধবার্তা দিয়ে সংযোগ গভীর বিষয় বিশেষ প্রচলিত। তবে অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে গন্ধ শুঁকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর মানুষকে তার অপরাধক্ষেত্রের সংযোগ স্থাপিত হয়।

কোনও ভাষা ছাড়া শ্রাব্য মাধ্যমের ব্যবহার মানুষও করে থাকে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে আদিবাসী উপজাতি এবং কৃষক বিদ্রোহে মাদল বা ডঙ্কার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের সহযোদ্ধাদরে সতর্ক করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সতর্ক করতে মাদল বাজালেও বিদ্রোহীদের সংগঠিত করতে প্রয়োজন হত মুখের ভাষা। ধর্মের মোড়কে হওয়া কৃষক বিদ্রোহে (যেমন, ওয়াহাবি, ফরাসি) ধর্মীয় প্রার্থনার সভা থেকেই নেতারা 'জেহাত' -এর ডাক দিতেন। সেই ডাক কখনও স্পষ্ট আবার কখনও কোনও রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে শাসক তা কখনও বুঝতে না পারে। এই মৌখিক বক্তব্য বিদ্রোহীদের উদ্বুদ্ধ করত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ব্যক্তি থেকে সংযোগ সংবাহিত হত সমষ্টিতে।

আবার হাল আমলের খেলার মাঠে এরকম কথা দিয়ে প্রাণিত করার খবর মেলে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল বাংলার বিশিষ্ট ফুটবল প্রশিক্ষক প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা পি কে-র ভোকাল টনিক যা তাঁর প্রশিক্ষণাধীন খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করত জান-প্রাণ লড়িয়ে ভাল খেলতে। কথ্যভাষার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের এ এক বড় উদাহরণ যা বার্তা গ্রাহককে সক্রিয় করে সংযোগের চরম উদ্দেশ্য সাধন করত।

তবে এটা মানতেই হবে, অঙ্গভঙ্গি, শব্দ বা কথ্যভাষার রয়েছে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা। যাকে বার্তা পৌঁছতে চাই সে যদি অকুস্থলে না থাকে তবে এই সংযোগ মাধ্যম কার্যকর হতে পারে না। তখন প্রয়োজন পড়ে লিখিত মুদ্রণ মাধ্যমের। আর এটা মানতেই হবে যে আজকের দিনে সংযোগের মূল মাধ্যম লিখিত। রোজকার ঘটমান জীবনের খবরাখবর আমরা পাই দৈনন্দিন খবরের কাগজ থেকে। যা ঘটেছে তার খবর বলে সংবাদপত্র, কেন ঘটেছে তা বলারও চেষ্টা করে আর ঘটল, কী তার তাৎপর্য সে কথাও আলোচনা করে খবরের কাগজ। এই সংযোগমাধ্যমের সঙ্গে আমরা বহু দিন পরিচিত। সকালে চায়ের পেয়ালার সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস আমাদের অনেকেরই জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

খবরের কাগজ খবর দেয়। কিছু আলোচনাও করে। আর তাকে আরও একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখে, বিশ্লেষণ করে সাময়িক পত্র। পৃথিবীর আন্দোলনের ইতিহাসে সংবাদপত্র - সাময়িকপত্র-প্রচারপত্র-পুস্তিকানির্ভর মুদ্রণ মাধ্যমের বড় ভূমিকার বহু নিদর্শন মেলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা, ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) কথা আমাদের দেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের কথা (১৯০৫-১৯১১)। এই সমস্ত আন্দোলনের সময়ে প্রকাশিত পত্রিকা-পুস্তিকা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত আন্দোলনে সামিল হতে। এখান থেকেই আর একটু এগিয়ে বলা যায় বইয়ের কথা। বই মুদ্রণ মাধ্যমের আরেক বড় উপাদান যা বার্তাকে স্থায়িত্ব দেয়; সংযোগ গড়ে ওঠে লেখকের সঙ্গে পাঠকের।

সংযোগ মাধ্যমে প্রযুক্তি এক বড় ভূমিকা রয়েছে। সংবাদপত্র - সাময়িকপত্র-পুস্তকে যেমন সহায় মুদ্রণপ্রযুক্তি তেমনই কালে কালে অন্য শ্রাব্য এবং দৃশ্য মাধ্যমের প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে যা সংযোগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছে বা করে চলেছে।

চেঁচিয়ে কথা বলা বা ভাল বাদ্য বাজিয়ে শ্রাব্য মাধ্যমের দ্বারা বার্তা বিনিময়ের রয়েছে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা। খুব দূরের জায়গায় তো আর এইভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায় না। তবে যন্ত্রের সাহায্য নিলে এই ক্ষেত্রটাই বড় বেড়ে। আর এক সার্থক উদাহরণ হল বেতারযন্ত্র। বেতারে অনেক গান, আলোচনা হয়। চলতে তাকে বার্তা-বিনিময় ও তথ্যের আদান - প্রদান। তবে আবেগের আদান - প্রদানের উদাহরণ দিতে গেলে বিশেষভাবে উল্লেখকরতে হবে বেতার নাটকের কথা। আর বেতার মাধ্যমের উত্তেজনা সংক্রামিত করার উপযুক্ততম উদাহরণ হল ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী। ধারাভাষ্যকারের 'গো-ও-ওল' বলার মধ্যে এক এক উত্তেজনা রয়েছে যে তার গুণে আমরা যেমন মাঠের মধ্যে গোল করাটা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেই কবে 'মহাভারত' -এর আখ্যানে দৃষ্টিহীন ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয়

যুদ্ধের বর্ণনা শুনিয়েছিলেন। সেও কি শ্রাব্য মাধ্যমে সংযোগের এক দৃষ্টান্ত ছিল না?

সংযোগের সংজ্ঞা মেনে বেতার সংযোগের মাধ্যমও এখন একমুখি নয়, উভমুখি। বিভিন্ন বেতার অনুষ্ঠানেই আজকাল রয়েছে শ্রোতাদের ফোন করার সুযোগ। বিশেষ করে এফএম বেতার জনপ্রি হবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে এই সমস্ত' ফোন-ইন ইন্টার অ্যাকটিভ' অনুষ্ঠানের। কথা বলে, শুধু শুনলে ভুলে যাওয়াটা সহজ। দেখলে বেশি মনে থাকে। দেখার একটা আলাদা ভাষা আছে। বাড়ির আলমারি থেকে বের করে পুরনো অ্যালবাম দেখলে অনেক পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায় না? ছবির অনুষঙ্গে চলে আসে নানা স্মৃতি। আর ছবির এই জোরের জায়গাটাকে কাজে লাগায় মুদ্রণ মাধ্যমের বিজ্ঞাপনের ছবি। আর তারপর আসে দৃশ্য মাধ্যমের ছায়াছবি। স্থিরচিত্রের জায়গায় চলচ্চিত্রের আবির্ভাব সংযোগ দুনিয়ায় এক নতুন মাত্রা এনে দেয়।

প্রথম পর্বের নির্বাক ছবি সফলভাবে বার্তা সঞ্চার করত। পাঠকের নিশ্চয়ই চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত সব ছবি দেখার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। নির্বাক যুগ পার হয়ে চলচ্চিত্র আজ দৃশ্য-শ্রাব্যর সমন্বয়ে এক শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা সিনেমা দেখি ও শুনি। তা আমাদের বাবার এমনকি প্রভাবিত করে আমাদের জীবনযাপনও। কোনও অভিনেতা- অভিনেত্রীর কথা বলার ধরণ আমরা অনুকরণ করি, কখনও নকল করি তার বেশ এমনকি কেশবিন্যাস। সিনেমা দেখতে যেতে হয় সিনেমা হলে। যেতে হয় বলব, না যেতে হত বলব? আজকের দিনে বাড়িতে থাকা টেলিভিশনে সব সময়ই প্রদর্শিত হয়ে চলেছে হরেক সিনেমা। চ্যানেল ঘুরিয়ে ইচ্ছে মতো কোনও সিনেমা দেখা যায়। রয়েছে অনেক অনেক চ্যানেল। যা যার রুচি মতো আলোচনা - খবর - সিনেমা - গান- কার্টুন - খেলা দেখতে পারেন। শুধু মাঝে মাঝে থাকবে বিজ্ঞাপন। আর রয়েছে টিভির নিজস্ব অনুষ্ঠান— টিভি সিরিয়াল যাতে যাতে কোনও এক আখ্যান পল্লবিত হতে থাকে ধারাবাহিকভাবে এবং দীর্ঘদিন ধরে।

ভার্চুয়াল দুনিয়া

আজকাল হামেশাই মিডিয়ার সর্বগ্রাসী আধিপত্যের কথা এদিক - ওদিক শোনা যায়। সেখানে বলা হয় টিভি আর সিনেমা কচিকাঁচাদের প্রভাবিত করছে। এক রঙিন সিনেমা আকর্ষণে তার এক অন্য দুনিয়ায় পা ফেলার চেষ্টা করেছে। এই অন্য দুনিয়া ঠিক বাস্তব নয়, 'ভার্চুয়াল'। আর এই 'ভার্চুয়াল' দুনিয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট' বা 'সামাজিক যোগাযোগ দুনিয়া'। এটা অবশ্য একেবারে হাল আমলের ব্যাপার। এ দেশে কমপিউটারের জনপ্রিয়তা নব্বই দশকে। ১৯৫৬ সালে কমপিউটার এদেশে এলে কী হবে, তা জনপ্রিয় হয় নব্বই দশকে। আর তা অনন্য হয় ওঠে ১৯৯৫ -এ ইন্টারনেটের ব্যবহার চালু হওয়ার পর। নিত্যনতুন প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ঘটতে থাকে। আজ যা নতুন প্রযুক্তি কাল তা পুরনো হতে থাকে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ নানান সুযোগ - সুবিধা পেতে থাকে আর তার বিস্তার ঘটেছে গত ১০-১৫ বছরে। আজকের দুনিয়ার নবতম সংযোগ মাধ্যম আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে হাজারো - লাখো বিষয়ে বিচিত্র তথ্য মেলে। জানা যায় এই দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে। সার্চ-ইঞ্জিনে মাউসের এক ক্লিকে হয়ে যায় বিশ্বদর্শন। এর মাধ্যমে চলে বাণিজ্যিক কাজও। রেলের টিকিট কাটা থেকে ব্যাঙ্কের কাজ বা জিনিসপত্র কেনাকাটা— সবেতেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আছে আন্তর্জাল।

এই অন্তর্জালকে কেন্দ্র করে আজকাল সামাজিক সংযোগের এক অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে আর এর পেছনে দায়ী অর্কুট, ফেসবুকের মতো 'সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট' বা 'সামাজিক সংযোগ দুনিয়া'। এই লেখার পাঠকদের সঙ্গে এই সাইটের পরিচয় করানোর কোনও দরকার আছে। বরং তথ্য হিসেবে জানানো যাক, অর্কুটের জন্ম ২০০৪ -এর ২২ জানুয়ারি আর ফেসবুকের ঐ বছরেরই ৪ ফেব্রুয়ারি। মাত্র সাত বছরের বালক বালিকার কী এমন করল যে তাদের নিয়ে প্রযুক্তিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ সকলেই এত ভাবিত? খুব সহজ করে ব্যাপারটা একটু বলা যাক। অর্কুট এবং ফেসবুক হচ্ছে এমন সাইট যেখানে নিজের পরিচয় (সামাজিক, ব্যক্তিগত, পেশাগত) এবং ছবি দিয়ে 'প্রোফাইল' তৈরি করা যায়। আর সেই 'প্রোফাইল' দেখে পুরনো বন্ধুরা বহু দিন আগের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে পেতে পরে। আবার ঐ 'প্রোফাইল' দেখে ভাল লাগলে যার প্রোফাইল তাকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠানো যায়। আর সে যদি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তার বন্ধু হয়ে যাওয়া যায়। এইভাবে বন্ধু বাড়তে থাকে। পুরনো বন্ধু আর নতুন বন্ধু মিলে সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু আরও আরও বন্ধু চাই। তৈরি হয় সংখ্যাবৃদ্ধির প্রত্যাশা। প্রত্যেকবার 'সাইন ইন' করার সময় মনে হতে থাকে, আজ আরও কিছু বন্ধুত্বের প্রস্তাব আসবে তো? এলে ভাল। আর না এলে হতাশা। মনোবিদরা বলছেন, প্রত্যাশা ভঙ্গের হতাশা এইভাবে কোনও একজনকে ম্রিয়মান, বিমর্ষ, বিষণ্ণ করে তুলতে পারে। মনে হয়, সায়নের বন্ধু সংখ্যা ৩১৯ আর আমার ৯৯-তেই আটকে আছে— শচীনের শততম শতরানের মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা! শুধুমাত্র বন্ধুত্বের প্রস্তাব আসছে না— এই কারণে বিষণ্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত কিন্তু দুর্লভ নয়।

এইসব সাইটে রয়েছে 'কমিউনিটি' বা 'গ্রুপ' যেখানে কোনও বিষয় বা ব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করা যায়, মন্তব্য লেখা যায়, মতামত জানানো যায়। এই বিষয়টা এইসব সাইটকে জনপ্রিয় করেছে। সামাজিক সংযোগ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে এর ফলে। ধরুন, আপনি শঙ্খ ঘোষের কবিতার অনুরাগী। এবার তাঁর কোনও কবিতা নিয়ে আপনি কথা লিখেছেন কমিউনিটিতে আর তা পড়ছেন শঙ্খ ঘোষের কবিতার গুণমুগ্ধ অন্য পাঠক। তিনি তা পড়ে তাঁর মতামত দিচ্ছেন। আলোচনা জমে উঠেছে। আলোচকরা তৃপ্তি পাচ্ছেন। কখনও একই অভিজ্ঞতার শরিক হচ্ছেন, আবার কখনও কবিতার এক নতুন পাঠ তাঁকে ভাবাচ্ছে। আর তা সম্ভ হচ্ছে অন্য আর একজনের মন্তব্য পড়ে। এই সামাজিক সংযোগকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? বাস্তব জগতে তার চেনা কেউ হয়তো শঙ্খ ঘোষের কবিতার নিষ্ঠ পাঠক নন কিন্তু ঐ কমিউনিটি শুধু ষ্টি পাঠকদেরই। ফলে সেখানে কথা বলতে পেরে ভারি ভাল লাগে। মজা হল, যাদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে কথা হচ্ছে তাদের কেউই হয়তো তার চেনা নয়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তারা প্রত্যেকেই শঙ্খ ঘোষের কবিতার অনুরাগী পাঠক

'কফি হাউসের আড্ডা' -র মতো 'কখনো বিষ্ণু দে, কখনও যামিনী রায়কে নিয়ে তর্কটা চলে।' মত বিনিময় চলে কমিউনিটিতে। সবটা যে অলস আড্ডা তা কিন্তু নয়। দস্তুর মতো সক্রিয়তার কথা হল, সক্রিয় হয়ে ওঠাও হয়। উদারহণ দিই— ২০০৭ সালে সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন সমাজের নানান

স্তরের মানুষ? সেই সময় প্রায় নিঃশব্দে জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল এই ধরেনের সাইটগুলো। অর্কুটে গড়ে উঠেছিল BAOS বা Be Aware of Surroundings' কমিউনিটি। সেই কমিউনিটির সদস্যরা শুধু মত প্রকাশ করেই থেমে থাকেনি। বাস্তবে মিলিত হয়েছে, ছাপানো পত্রিকা বের করেছে। আর এইসব কাজটাই হয়েছে অ-বাণিজ্যিকভাবে— কণিুনিটি সদস্যাদের স্বেচ্ছাশ্রমে। একইরকম আলোড়ন তৈরি হয়েচিল রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুর পর। তাঁর সমর্থনে গড়ে উঠেছিল একের পর এক কমিউনিটি। ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিল ই-দুনিয়া। এইভাবে মত প্রকাশ, জনমত গড়ে তোলা এবং সক্রিয় হয়ে ওঠার নতুন সংযোগ মাধ্যম অভূতপূর্ব। খবরের কাগজের পাঠকের চিঠির সঙ্গে এর তুলনা চলে না। কোনও সংগঠনের গড়ে তোলা সংগঠিত আন্দোলনেরও সঙ্গেও একে মেলানো যায় না। কোনও নির্দিষ্ট একটা বিষয় বা উস্যুকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোট গড়ে সক্রিয় হচ্ছেন যাঁরা, তাঁরা পরস্পরকে আগে ভাগে চিনতেই না। আর এখানেই এই জাতীয় সংযোগ মাধ্যমের কৃতিত্ব।

ইতিবাচক দিকের পাশাপশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে বৈকি! কোনও কাজের দায়িত্ব না গিয়ে লম্বা চওড়া কথা বলে নিজেকে অত্যন্ত সমাজ-সচেতন হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াসের দেখা মেলে। কখনও দেখা যায় অশালীন মন্তব্য, অশ্লীল ইঙ্গিত। জাল প্রোফাইল তৈরি, যৌনতা সর্বস্ব কমিউনিটি, এ সবও চলে। তবে তাঁটার জন্য তো আর গোলাপ ফুল ধরার ইচ্ছে মানুষের চলে যায় না। তাই এইসব নেতিবাচক দিকের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব কমেনি।

ইমেল তুলনায় পুরনো। এটা ব্যক্তিগত যোগাযোগর জায়গা। আমাকে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা চিঠি পাঠাল, আমি সেটা পড়লাম, প্রয়োজন মনে হলে বা ইচ্ছে করলে উত্তর দিলাম বা দিলমা না। এর মাধ্যমে যোগাযোগ অতি দ্রুত হয়েছে। আজ আর ডাকের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। ইমেলে তাৎক্ষণিকভাবে চিঠি চলে আসে। প্রতি সেকেন্ডেই চিঠি আসতে পারে। কিন্তু ইমেলের এই দ্রুততাকে হারিয়ে দিয়েছে তাৎক্ষণিক 'চ্যাটিং'। চ্যাটে আপনি অন - লাইন হওয়া মাত্র আপনার নামের পাশে একটা আলো জ্বলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে থাকা আপনার বন্ধু-বান্ধবরা জেনে গেলেন যে আপনি এখন অনলাইনে আছেন। স্মাইলি বা হাসিমুখ পাঠানো দিয়ে শুরু হয়ে, হাই-হ্যালো পার হয়ে হার্দিক সম্পর্কও তৈরি হয়ে যেতে পারে চ্যাট বন্ধুর সঙ্গে। পাঠকের অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর ছবি 'অন্তহীন' মনে পড়বে— 'রাত জাগা পাখি' রাত জেগে চ্যাট করত। কথা লিখতে লিখতে এক পুলিশ অফিসার আর এক সাংবাদিক পরস্পরের বন্ধু, কাছের মানুষ হয়ে গেল যার বাস্তবে পরস্পকে দেখেইনি, চেনার প্রশ্নই নেই। বহু মানুষ এভাবে যেমন নিজের জীবনসঙ্গী খুঁজে পাচ্ছেন তেমনই আবার প্রতারিতও হচ্ছেন। সম্পর্কের প্রতারণা। বন্ধুত্বের প্রতারণা। হয়তো যে তরুণীর সঙ্গে আপনি দিনের পর দিন চ্যাটে কথা বলে চলেছেন, তার প্রতি একটা হৃদয়গত দুর্বলতা তৈরি হচ্ছে, হঠাৎই জানতে পারলেন বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। এ এক মধ্যবয়স্ক পুরুষের জাল প্রোফাইল। সে কিন্তু কোনও আর্থিক প্রতারণা করেনি, শুধু আবেগগত আঘাত করেছে। অনেকেই যে আঘাত সামলাতে পারে না!

সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেকেই নানান ছবি আপলোড করে। তার মধ্যে হয়তো কিছুটা দেখনাদারিও থাকে। অমুক দেশে বেড়িয়ে এলাম, অমুক সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছি জাতীয় ছবি থাকে। আর থাকে 'সেলিব্রিটি'দের সঙ্গে ছবি, তারা কত আপন বোঝাতে। এই আদেখলেপনা বাদ দিয়ে পুরনো নস্টালজিক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। আশির দশকের কলকাতার ছবি। সেই 'কবেকার কলকাতা, হারানো শহরে' কোনও এক স্কুলের পুরনো গ্রুপ ছবিতে এক সেন্টিমিটারে নিজের আর বন্ধুদের 'হারিয়ে যাওয়া মুখ' আবিষ্কার করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার কোনও আর্থিক পরিমাপ হয় না!

কিন্তু সেই আনন্দ নেওয়ার মনটা সবার আছে তো? আজকের এই মিডিয়ার সর্বগ্রাসী সময়ে আর সব কিছু পণ্য করে তোলার পরিস্থিতিতে কেমন 'বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া/ তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত/ নিওন আলোয় পণ্য হল/ যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।' শঙ্খ ঘোষ সেই কবে ১৯৮৪ - তে 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' -এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। তা যেন আজ সত্যি, আরও সত্যি হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত পরিসরকে গ্রাস করতে উদ্যত আজকের সংযোগ মাধ্যম। কোনও সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরে এরকম সংযোগমাধ্যমে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি আজ দুর্লভ নয় আবার কোনও সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর যারা পরস্পরকে কাদা ছুঁড়ল না, বরং দেখা গেল পাশে বসে দু'দণ্ড কথা বলার সৌজন্য বজায় রাখল, তাদের সেই সৌজন্যের প্রতি ন্যূনতম সৌজন্য দেখাতে পারল না তাদেরই অন্য কোনও বন্ধু বা বান্ধবী, এমন দৃষ্টান্তও মেলে। কাদা ছোঁড়ার মহান দায়িত্ব হয়তো এদেরই কেউ নিজে কাঁধে তুলে নেয়, সাইটে কোনও মন্তব্য করে বা বিশেষভাবে সেই দু'জনের কোনও ছবি 'আপলোড' করে। এসব সে কি চিন্তা ক'রে? নাকি এই মাধ্যম চিন্তার সুযোগ দেয় না, তাৎক্ষণিক ভাবনাকেই লালন করে? কে জানে!

অনেকের অভিযোগ, এরকম 'ভার্চুয়াল দুনিয়া' আদতে অগভীর। 'বড় বেশ কথা বলা' হয় এই দুনিয়ায়। অথচ সব সময় যে সব কথা বলতে হয় তাও তো নয়। বার্তা পৌঁছনোর ইন্দ্রিয়াতীত যে মাধ্যম আছে তাকেই বা ভুলি কী করে? 'চোখে চোখ পড়া মাত্র ছোঁয়া লাগল চোখের পাতায়— সেই তো যথেষ্ট স্বর্গ— সেই স্বর্গ ভাবি আজ।' (জয় গোস্বামী স্পর্শ')। মজা হল, যে দুনিয়ার বিরুদ্ধে কথাসর্বস্বতার অভিযোগ, বড় বেশি বড় বড় কথা বলার অনুযোগ, তার সঙ্গে বেশি সখ্য তেমন মানুষের যাঁরা ব্যক্তিজীবনে খুব বেশি লোকের সঙ্গে মেশেন না, নিজের জগতে থাকেন আর নিজের মতো করে পড়াশোনা আর বা চিন্তা করেন। আসলে তাঁদেরই তো ভাবনা ভাগ করার ভাগীদার বন্ধুর অভাব। এই সাইট আছেন বলেই তো তাঁরা বলতে পারছেন সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'শ্রী শম্ভু মিত্র' কেমন লাগল বা জয় গোস্বামীর 'দুদণ্ড ফোয়ারা মাত্র' মনকে কতটা ছুঁয়ে গেল! আর এখানেই প্রচারের বাইরে শুধুমাত্র বিষয় গুণে কথা বলা চলে লেখক বা শিল্পীর সঙ্গে। কিন্তু যদি কারুর মনে হয়' একটা দুটো সহজ কথা/ বলব ভাবি চোখের আড়ে/ জৌলুস তা ঝলসে ওঠে/ বিজ্ঞাপনে, রং-বাহারে', তবে তার জন্য রয়েছে চ্যাট। সেখানে দু'জনে মিলে কথা বলা চলে। আমি দু'জনকে চিনি যারা চ্যাট বন্ধু হয়েছিল কলকাতার ভবানীপুরের গলি-গুঁজিতে হাঁটার গল্প করতে করতে। এই মানুষগুলোর কাছে যোগাযোগের এই নতুন মাধ্যম এক নতুন জগৎ নিয়ে হাজির হয়েছে। একালের এই সংযোগ মাধ্যমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে— এমন সাধ্য কার?

আর তাই মোটেই অবাক হই না 'বাঘে - গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া'র মতো ভাবুক-চিন্তক, জালিয়াত-চালিয়াত, পুলিশ (কলকাতা পুলিশ), গোয়েন্দা (সিবিআই) সকলকেই একসঙ্গে হাজির হতে দেখে।